স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙলার বিপ্লবীসমাজ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

২০০৫-এ স্বদেশী আন্দোলনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হলো। সেই উপলক্ষ্যে নানাভাবে ঘটনাটিকে স্মরণ করা হচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনকে ঐতিহাসিকরা দেখেন নথিপত্র, স্মৃতিকথা ইত্যাদির নিরিখে। একে বলা যায় দূর থেকে দেখা। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তার হিসেবনিকেশ এখন করা হচ্ছে; তার থেকেই তৈরি হচ্ছে লাভক্ষতির খতিয়ান।

কিন্তু সকলের হিসেব এক হয় না। কার হিসেবে লাভের অঙ্কটাই বেশি; কেউ বা আবার ক্ষতির দিকটাকেই বড় করে দেখেন। হ্যাঁ, ১৯০৫-এ যে বাঙলা ভাগ হয়েছিল, ১৯১১-য় তা জোড়া লাগল বটে, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এসে গেল বোমার রাজনীতি কসাই কাজি কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী মেরে বসলেন ভুল লোককে। তারপর ধরা পড়লেন অরবিন্দ ঘোষ সমেত বাঙলার তণ বিপ্লবীরা। শু হলো মুরারিপুকুর বোমার মামলা। স্বদেশী আন্দোলনের মূলস্রোতে দেখা দিল ভাঁটার টান।

অত্যাচার, নিপীড়ন, কারাবাস, দ্বীপান্তর -- কিছুই কিন্তু আটকাতে পারে নি শহরে - গ্রামে ছড়িয়ে থাকা বাঙলার বিপ্লবীদের মাঝে মাঝে চুপ থাকলেও বারে বারে গর্জে উঠেছে তাঁদের রিভলভার। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে পুলিশের গোয়েন্দা -- কেউই রেহাই পায় নি। এই ধরণের ব্যক্তিহত্যার নিন্দে করেছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে গাঁধি ও রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথমেই মনে আসে। তবে এও ঘটনা যে বিপ্লবীদের মত ও পথের নিন্দে করলেও তাঁদের দেশপ্রেম নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন নি (ইংরেজ শাসক আর তাঁদের কিছুতঁাবেদার ছাড়া।'

স্বদেশী আন্দোলন যখন শুর হয়েছিল, তখন তার নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধু - অনুগামীরা। এঁরা বিশ্বাস করতেন ইংরেজ জনসাধারণের সদ্‌বুদ্ধির কাছে আবেদন করলে বঙ্গভঙ্গ রদ হবে। ভারতে ইংরেজ শাসকরা যদি তাঁদের কথায় কান না দেন, বিলেতের পার্লামেন্ট নিশ্চয়ই তাঁদের দাবি যুক্তিযুক্ত বলে মানবেন। ১৯০৩ থেকে বহু আবেদন - নিবেদন করে যখন কোনো লাভ হলো না, তখন পরিস্থিতির চাপে ব্যধ্য হয়েই বাঙলার নরমপন্থী নেতারা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট-এর সিদ্ধান্ত নিলেন।

এ ব্যাপারে একটি মজার গল্প না বললেই নয়। ১৯০৯-এ সুরেন্দ্রনাথ গেছেন বিলেতে। রিভিউ অফ রিভিউস্ পত্রিকার সম্পাদক, উইলিয়াম স্টিড-এর বাড়িতে একটা ছোটো ভোজসভা হচ্ছে। উপস্থিত আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পালও সেখানে নিমন্ত্রিত। স্টিড হঠাৎ একটি চাবুক হাতে ভোজসভায় ঢুকে সুরেন্দ্রনাথকে বললেন "মিস্টার ব্যানার্জী, আপনাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো আর আপনি জানতেন যে জল্লাদের খড়্গ আর দু-মিনিট পরেই আপনার শিরচ্ছেদ করবে, সে-অবস্থায় আপনার মাতৃভূমির জন্য সেই শেষ মুহূর্তে আপনি কোন বাণী রেখে যেতে ইচ্ছে করতেন?"২

এক মুহূর্তে দ্বিধা না করে সুরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন "আমি এই বলতাম (এক) বঙ্গভঙ্গ সংশোধন কণ; (দুই) নির্বাসিত দেশপ্রেমিকদের মুক্তি দিন আর যে আইন দিয়ে হেবিয়াস কর্পাস বাতিল করা হয়েছে, সেটি প্রত্যাহার কন; (তিন) সমস্ত রাজনৈতিকবন্দীদের ক্ষমা কন; (চার) ভারতবাসীদের তাঁদের নিজস্ব শুল্কনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিন; (পাঁচ) কানাডার অনুকরণে ভারতকে সংবিধান দান কন। এই বলে আমি চরম দণ্ড গ্রহণের জন্যে এগিয়ে যেতাম।"

এই ছিল সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ-র সিদ্ধান্ত আর পুরোপুরি বাতিল করা যাবে না। সেটাকে কিছুটা এধার - ওধার করাই যথেষ্ট। অন্যান্য বিষয়েও কোনো সঙঘাতে না গিয়ে দয়ার দান পেলেই তিনি খুশি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ঘোর বিরোধী ছিলেন চরমপন্থীরা (তাঁরা অবশ্য নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী দল' বলাই পছন্দ করতেন)। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁরাও কোন সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা বলতেন না। যে কোনো রকম হিংসামূলক কাজের বিরোধী ছিলেন বিপিনচন্দ্র। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-ই তাঁর আদর্শ। তার জন্যে তণ বিপ্লবীরা তাঁকে অপছন্দ করতেন। বিপ্লবীদের মুখপত্র যুগান্তরে তখন "বর্তমান রণনীতি"নামে একটি ধারাবাহিক রচনা বেচ্ছে। যুগান্তর -এর অন্যতম সম্পাদক, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-কে ব্যঙ্গভরে বিপিনচন্দ্র প্রশ্ন করেন "বর্তমান রণনীতি কাগজে লিখে দেশে বিপ্লব আনবে?"৩ সন্ধ্যা পত্রিকার দফতরে একবার বিপ্লবীরা বিপিনচন্দ্রকে ঘিরে ধরলেন। তাঁর সাফ জবাব, "ভারতে বাস্তিলের পতনও হবে না, কামান বন্দুক দেগে বিপ্লবও হবে না।" তারপর কী ভেবে আবার এও যোগ করলেন, "তবে দু-একটা ডাকাতি কি হবে না? দু-একটা বোমা কি ফাটবে না?"৪

অরবিন্দ ঘোষও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতির কথাই বলতেন ও লিখতেন। বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক মর্যাদার দাবিদার। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলতে তিনি কিন্তু রক্তপাতহীন বিপ্লব বোঝেন নি, বরং তাঁর বক্তব্য ছিল পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধের ধরণ নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় হবে। আর আয়ারল্যান্ড বা রাশিয়ায় যেভাবে শাসকশ্রেণীর বিদ্ধে সেখানকার মানুষদেরলড়তে হয়, দরকার পড়লে ভারতেও তেমন পথ নিতে হবে। সবটাই নির্ভর করছে পরিস্থিতির উপর। অর্থাৎ রক্তপাত না রক্তপাতহীন - এই প্রশ্নে অরবিন্দ কখনোই বিপিন চন্দ্রের একটিই নীতি আঁকড়ে থাকেন নি। আঘাতের বিদ্ধে সশস্ত্র প্রত্যাঘাতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল ন া, বরং সমর্থনই ছিল।৫

অন্যদিকে বাঙালির বিপ্লবীরা কোনদিনই বিশ্বাস করেন নি যে, বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন করা যাবে। "সোনার বাঙ্গলা" নামে একটি গোপন ইস্তাহারে লেখা হয়েছিল

বাঙ্গালি! বন্দুক নাই বলিয়া ভয় পাও কেন? পৃথিবীর যেসব দেশ সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; তাহারাও প্রথমে নিরস্ত্র ছিল, কুড়ুল, বর্ষা (বর্শা), তরবারীই তাহাদের বিদ্রোহের প্রথম উপকরণ ছিল। পরে শত্রুর হস্তের অস্ত্র নানা প্রকারে কাড়িয়া লইয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিল। তোমার দেশে অনেক অস্ত্র আছে, তাহা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।৬

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য আর উপায় নিয়ে অনেককটি মত ছিল। এগুলির বাইরেও ছিল 'গঠনমূলক' স্ব দেশীর চিন্তা। রাষ্ট্রকে এড়িয়ে সমাজকে তার বিকল্প হিসেবে খাড়া করতে চেয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।৭ এরই রকমফের দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ"-এর প্রস্তাবে। ব্রহ্মবান্ধব অবশ্য পরে বিপ্লবীদের মতোই ভাবতে শু করেন আত্মরক্ষার কারণেই ল াঠির বদলে লাঠির দরকার আছে।৮ সন্ধ্যা-য় একবার লেখা হয়েছিল (০৮.০১.১৯০৭) ফিরিঙ্গির আগ্নেয়াস্ত্র থেকে কীভাবে আমর া নিজেদের বাঁচাব? কালি মাইকী বোমার ওপরেই আমাদের ভরসা করতে হবে।৯

এঁদের বাইরে ছিলেন রাজভক্তর দল। তাঁরা বলতেন আগে দেশের লোককে স্বাধীনতা পাওয়ার উপযুক্ত করে তোলা দরকার -- ত ার জন্যে প্রথমে সমাজ - সংস্কারের কাজ শেষ করতে হবে। সুতরাং রাজনীতির প্রসঙ্গ এখন মুলতুবি থাক।

এতগুলো মত ও পথের ভেতরে কোন্‌টি সবচেয়ে কাজে লেগেছিল? এমন প্রশ্ন তোলাই ভুল, কারণ কাজে লেগেছিল অল্পবিস্তর সবকটিই। কোনো সশস্ত্র উদ্যোগ ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছনো যেত কিনা -- এমন জল্পনা করা অর্থহীন। ভারতের রাজনীতিতে গাঁধিরআ বির্ভাবের আগেই - স্বাধীনতা আন্দোলনে সবকটি ধারাই দেখা দেয়; শুধু অহিংস ধারাই একমাত্র ধারা ছিল না।

লক্ষ্যর চেয়ে উপায়কে যাঁরা বড় করে দেখেন তাঁরা অবশ্য এই বক্তব্যর সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু অহিংসাকেই একমাত্র পথ বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ইতিহাসের সাক্ষ্য বরং বলে অহিংস গণ - আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগ, ত ার আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও, কম ফল দেয় নি। বাঘা যতীন থেকে সুভাষচন্দ্র বসু বর্যন্ত সকলেই সেই পথ বেছে নিয়েছিলেন। ব্যক্তিহত্য া বা সন্ত্রাসবাদ নিয়ে যত প্রশ্নই থাকুক, তার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না। যদি অহিংস পথে লক্ষ্যে পৌঁছনো যেত, তবে অবশ্যই সে-পথ চলতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে অহিংসা অনেক সময়েই আপস - রফার অন্য নাম। দেশ ও দেশবাসীর সম্মান রাখতে দরকার পড়লে অস্ত্র তুলে নিতে হয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব ভাষায় তাই বলেছিলেন "...যদি কেহ তোমাকে ঠেঙ্গাইতে আসে -- তা সে ফিরিঙ্গিই হইক বা তাহার চৌদ্দপুষ হোক তাহাকে ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। ইহা বিধাতার নিয়মের চেয়ে বড়।"১০ একজন ঈশ্বরবিশ্বাসীর পক্ষে এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে?

ওপরে যাঁদের নাম করা হলো তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। পরে তাঁদের কেউ কেউ যা-ই করে থাকুন, তার জন্যে স্বদেশী যুগে ত াদের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব ম্লান হয় না। কিন্তু ব্যক্তি মানুষকে দেখে মতের বিচার করা ঠিক নয়। অহিংসার বিষয়ে যদি কেউ মনস্থির করতে চান, তাকে সে-কাজ করতে হবে নীতির ভিত্তিতে। আমি মনে করি, সে-নীতির প্রথম কথা হলো উপায় কখনও উদ্দেশ্যর চেয়ে বড় হতে পারে না।

জানি, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ছলে - বলে - কৌশলে মতলব হাসিল করাই কি একমাত্র পথ?

না। লক্ষ্যটা সৎ না অসৎ সেটাও ঠাওর করতে হয়। কিন্তু এ-ও ঘটনা যে, লক্ষ্য মহৎ হলে তার উপায়ও মহৎ হয়। শুধু পরের প্রাণ নেওয়া নয়, নিজের প্রাণও দিতে হয়। একে হিংসা বা বলপ্রয়োগ বলে অপবাদ দেওয়া ঠিক নয়। প্রেসিডেন্সি জেলে বেইমান নরেন গোঁসাইকে মেরে কানাইলাল -সত্যেন্দ্রনাথ অন্যায় কিছু করেন নি। বরং তাকে ক্ষমা করাটা নিজেদেরই অক্ষমতার প্রমাণ দিত।১১

দ্বিতীয় নীতি হলো অহিংসা বা সশস্ত্র সংগ্রাম -- এর কোনো একটির ব্যাপারে অনড় থাকাও অবাস্তব। কবে দেশের সমস্ত মানুষ নিজেদের ভালো বুঝবেন, রাজনীতি - সচেতন হবেন -- তার জন্যে অনন্তকাল অপেক্ষা করা যায় না। বরং গণ - আন্দোলনের ধাক্ক াতেই অনেক মানুষ একসঙ্গে চমকে জেগে ওঠেন। সে - আন্দোলনের চেহারা অহিংস হতে পারে, সশস্ত্রও হতে পারে। বাঙলার তণ বিপ্লবীদের প্রধান কৃতিত্বই এই যে তাঁদেরই উদ্যোগে স্বদেশী আন্দোলন বাঙলার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। গর্ব করে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন

স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লববাদের সৃষ্টি করে নাই; বরং মফঃস্বলে স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লববাদীদের দ্বারাই পরিচালিত ও পরিপোষকতা

প্রাপ্ত হইত। স্বদেশী আন্দোলনের বেগ ও বৃদ্ধি বিপ্লববাদী সমিতির সাহায্য দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনকেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও কংগ্রেসওয়ালাদের বক্তৃতার গরমে কৃতকার্য হয়নাই, বরং প্রত্যেক জায়গায় বিপ্লববা দিরা কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া স্বদেশী আন্দোলনকে পরিচালিত করিতেন। তাহাকে কৃতকার্য্য করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন।১২

কথাগুলো মিথ্যে নয়। বিপ্লবীদের আত্মত্যাগেই বাঙালির ভীতার অপবাদ ঘুচে যায়,১৩ তাঁরাই খোলা গলায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। দেশ কবে তৈরি হবে তার জন্যে তাঁরা বসে থাকেন নি। ভারতের বাইরে তাঁরাই ব্রিটিশ শাসনের নগ্নরূপ তুলে ধরেন। অহিংসার ব্যাপারে তাঁদের মনোভাব ছিল একবগ্‌গা -- এই কারণে তাঁদের খারিজ করলে, শুধু তাঁদেরই অপমান করা হয় না, অস স্মান করা হয় বাঙালির গৌরবময় ঐতিহ্যকে।

-ঃ টিকা ঃ-

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর প্রবাসী -র বিবিধ প্রসঙ্গ-য় লেখা হয়েছিল

ক্ষুদিরামের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। আমরা তাহার বিচারক হইবার অযোগ্য। কারণ, তাহার কার্য্য ধর্ম্মবিদ্ধ হইলেও, তাহার হৃদয়ে দেশভক্তি উৎকট বিদেশীদ্বেষে পরিণত হইলেও, ইহা সত্য যে দেশভক্তি যেমন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, ইহা তেমন করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে নাই। তাহার জীবন যেমনই হইক, সে মরিয়াছে বীরের মত। তাহার বিপথচলিত ব্যর্থ জীবন আমাদিগকে বিষ াদ ও চিন্তায় আকুল করিয়াছে। মানুষ তাহাকে সুপথে চালিত করিবার উপায় করিতে পারিল না, ভগবান করিবেন। বিধাতা অমঙ্গ ল হইতে মঙ্গলের সৃষ্টি করেন; আমরা বিশ্বাস করি এক্ষেত্রেও তাহাই করিবেন। নিরপরাধ ইংরাজ স্ত্রীলোক দুটির আত্মা তোহার আত্ম াকে ক্ষমা করিবে। (৮ ৫, ভাদ্র ১৩১৫, ২৯৫-৯৬)

বিপ্লববাদ সম্পর্কে মৌলিক আপত্তি সত্ত্বেও এখানে কিশোর শহিদ ক্ষুদিরামকে অসম্মান করা হয় নি। সারা জীবন বিভীষিকাপন্থা'-র নিন্দাবাদ করে এলেও ১৯৩৯-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

তার (বঙ্গভঙ্গরোধ আন্দোলনের) পরবর্তীকালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল -- ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দাণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তে া তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনের চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু ত াণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন কক, তবু কি কালো করতে পেরেছে ত ার অন্তর্নিহিত তেজস্বিতাকে?

(''দেশনায়ক'', র-র ১৬ ১২৩৬)।

এখানেও, মতের অমিল সত্ত্বেও বিপ্লবীদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নি।

২। জাতি যখন গঠনপথে, ৪৪৬-৪৭। পরে উদ্ধৃতিও ঐখান থেকে।

৩। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৮৩), ১৫৮।

৪। ঐ, ১৫৯।

৫। বিশদ আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৫ খঃ) দ্র।।

৬। এই ইস্তাহার ও একই নামের অন্যান্য ইস্তাহার নিয়ে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৫ ক) দ্র.।

৭। উপাধ্যায়, রচনাসংগ্রহ, ৯৯।

৮। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ''তাঁহার (ব্রহ্মবান্ধবের) মৃত্যুর শেষ সময় তিনি বৈপ্লবিক মতবাদী হইয়াছিলেন'' ((১৯৮৩), ১৩৯)। এ ব্যাপারে তণ বিপ্লবীদের তরফেই তিনি কৃতিত্ব দাবি করেছেন, সন্ধ্যা ''প্রথমে বিশেষভাবেই নরমপন্থীয় ছিল। পরে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ গরমপন্থীয় যুবকদের সঙ্গে মিশিয়া এবং দেশের লোকের মেজাজও গরম হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকার সুরও গরমপন্থী হয়'' (ঐ, ১৩৮)।

লাঠির বদলে লাঠির কথা আছে রচনাসংগ্রহ, ১০০-য়।

৯। লিপনার, ৩৬৪।

১০। রচনাসংগ্রহ, ১০০।

১১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ''গোস্বামীর মৃত্যু - শাস্তিতে নাকি ইওরোপীয় বৈপ্লবিকেরা বাহ্‌বা দিয়াছিলেন। প্যারিসের সোসা লিষ্ট (উপস্থিত কম্যুনিস্ট) মুখপত্র 'Humanite [L' Humaniteৰ নাকি লিখিয়াছিল ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যে প্রকারে শত্রুপুরীর ভিতর থাকিয়াও রক্ষীবেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে, তাহা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম'' ((১৯৮৩), ৬০)।

এই খবরটি কি যাচাই করে দেখা যায় না?

১২। (১৯৮৩), ১৩। আসলে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদ পরস্পর পরিপূরকের কাজ করেছিল। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯৬), ২১-২৫ দ্র.।

১৩। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালির নতুন মূর্তি দেখে গোখলে এক বক্তৃতায় যা বলেছিলেন, তা সকলেই জানেন। এখানে বারাণসী কংগ্রেসে (১৯০৫) লালা লজপত রায়ের বক্তৃতার একটি অংশ তুলে দিচ্ছি

বারাণসী কংগ্রেসের আর উল্লেখযোগ্য -- লালা লাজপৎ রায়ের বক্তৃতা। তিনি বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে বাঙ্গালাকে অভিনন্দিত করেন -- কেন না, এই উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালা নূতন রাজনীতিক যুগ প্রবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছে। এ কাযের সম্মান বাঙ্গালার জন্যই ছিল -- কেন না, বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী শিক্ষার স্বাদ পাইয়াছে। বাঙ্গালার সিংহ এত দিন শৃগালের দশায় ছিল -- লর্ড কার্জ্জন আমাদের উপকার করিয়াছেন। আজ উন্নতির যাত্রায় বাঙ্গালা যে অগ্রণী হইয়াছে, সে জন্য তিনি বাঙ্গালার সৌভাগ্যে ঈর্ষানুভব করিতেছেন। বাঙ্গালা ভীতার অপবাদ প্রক্ষালিত করিয়া যে সাহস দেখাইতেছে, তাহা অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণযোগ্য। বিলাতে লোক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বিলাতের লোক ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণা করে -- ভিক্ষুক ঘৃণার পাত্র। ইহাতেই বুঝা যায়, বঙ্গভঙ্গের বিদ্ধে যে আন্দোলন হয়, লালা লজপৎ রায় তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিল -- তাহা নূতন জাতীয়ভাবের অভিব্যক্তি। (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ১৩৩ দ্র.)।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার অমিতাভ ভট্টাচার্য, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত, মলয়েন্দু দিন্দা।

ঃ রচনাপঞ্জি ঃ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব রচনাসংগ্রহ। কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন, ১৯৮৭।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র - রচনাবলী। খণ্ড ১৬। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।

। অনির্বাণ অগ্নিশিখা। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ইতিহাসবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা। অনুষ্টুপ, ১৯৯৬।

---। " 'একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে' ...", পরিচয়, বৈশাখ - আষাঢ় ১৪১২ (২০০৫ ক)।

---। "রাষ্ট্রভাষাতত্ত্বর দিকে", অনুষ্টুপ, শারদ সংক্যা ২০০৫ (খ)।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতি যেদিন গঠন পথে। ভারতসভা, (১৯৭৭)।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। কংগ্রেস। বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির, ১৩২৮ ব.।

Lipner, Julius, J. Brahmabandhab Upadhyay : The Life and Thought of a Revolutionary. Delhi: Oxford University Press, 1999.